বৃহস্পতিবার, ১২ চৈত্র ১৪২৬ ■ ৪০ বর্ষ ■ ৩০৬ সংখ্যা

আজ

'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার', 'পদ্মভূষণ'-এ সম্মানিত চলচ্চিত্র প্রযোজক, নির্দেশক তথা অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৩ সালে কলকাতায়। তাঁর পড়াশোনা শান্তিনিকেতনে। হায়দরাবাদের স্টেট আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দক্ষ ছিলেন মেক-আপের কাজেও, যার প্রমাণ মিলেছে তাঁর লেখা বই 'ভাবকি অভিব্যক্তি'-তে। ব্রিটিশ শাসনকালে ও স্বাধীন ভারতে সিআইডি অফিসারদের এই বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ দিতেন। ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণকারী সংস্থা তাঁর হাতে গড়ে ওঠে। পরে যোগ দিয়েছিলেন নিউ থিয়েটার্সে।

কর্তব্য

দেশজুড়ে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করে নোভেল করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানিয়েছিলেন, এই লকডাউন একপ্রকার কার্ফিউ তো বটেই। জনতা কার্ফিউয়ের চেয়েও আরও কয়েক কদম কড়া এই ব্যবস্থা। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আগামী তিন সপ্তাহ চলবে এই সম্পূর্ণ লকডাউন। করোনা মহামারিকে ঠেকাতে এটাই একমাত্র উপায় বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। অবশ্য তাঁর ঘোষণার আগেই পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, হিমাচলপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউনের পথে হেঁটেছিল। কেন্দ্রের পরামর্শ মেনে কোথাও কোথাও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য দিনরাত সরকারের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে একশ্রেণির মানুষ লকডাউনে কার্যত ছুটির মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। জরুরি প্রয়োজন না থাকলেও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে অযথা ভিড় করছিলেন, জটলা করছিলেন। কোভিড-১৯ এর বিপদ একশোভাগ জেনেবুঝেও তাঁরা এমন আচরণ করছিলেন যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তো বটেই, তাঁদের পরিবার, এলাকা, রাজ্য, সমাজ ও দেশকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। নিজেকে ঘরবন্দি না রাখলে এই মহামারিকে আটকানো যাবে না জেনেও কিছু মানুষ এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও কাজকর্ম করছিলেন, ফলে সরকারকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এমন কঠোর অবস্থান নিতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, প্রত্যেকের বাড়ির বাইরে লক্ষ্মণরেখা টেনে দেওয়া হল। এর বাইরে যাওয়ার অর্থ বিপদ ডেকে আনা। সরকারের এই পদক্ষেপ ভালো লাগুক, খারাপ লাগুক, পছন্দ হোক না হোক, প্রত্যেক ভারতীয়র উচিত, দায়িত্বসচেতন নাগরিক হিসেবে একে সমর্থন করা এবং সরকারের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা। মানুষে মানুষে মেলামেশা করলে যে রোগ মহামারির রূপ ধারণ করে, মানবসভ্যতার অস্তিত্ব সংকটে পড়ে তার থেকে নিজেকে, নিজের পরিবার, সমাজ, রাজ্য, দেশ ও গোটা মানবজাতিকে রক্ষা করতে যদি ঘরবন্দি রাখা একমাত্র উপায় হয়, তাহলে মানুষ হিসেবে সেটাই প্রত্যেকের এই মুহূর্তে এক ও একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত।

বিপর্যয় রোধে শুধু নাগরিকরাই কর্তব্যপালন করবেন তা কিন্তু নয়। সরকারেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যেমন- মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলির জোগান অব্যাহত রাখা। জরুরি পরিষেবাগুলি নিশ্চিত করা। যাঁরা কাজকর্ম ছেড়ে গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন তাঁদের যাতে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে সরকারকেই। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জোগানে কোনও অসুবিধা হবে না। একই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাতেও মানুষ আশ্বস্ত হতে পারছেন না। একশ্রেণির মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে অস্বাভাবিক পরিমাণে চাল, ডাল, আটা, নুন, তেল, চিনি, মুড়ি, চিঁড়ে, বিস্কুট ইত্যাদি কিনে মজুত করছেন তাতে বাকিদের জন্য প্রায় কিছুই পড়ে থাকছে না। মুদিখানার সামগ্রী, বাজারের সবজি এমনকি দুধ, ডিম, পাউরুটি ইত্যাদি কিছুই থাকছে না। র‍্যাশন দোকানে লম্বা লাইন পড়েছে। বাজারে ভিড় থাকছে। একদিকে মানুষকে ঘরের বাইরে বেরোতে বারণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে আতঙ্কিত হয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মজুতের চেষ্টা চলছে। এতে করোনা বিপর্যয়ের পাশাপাশি বড়রকমের আর্থসামাজিক সংকটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এখন সরকারের সমালোচনা করার সময় নয়। বরং একজোট হয়ে কীভাবে করোনার মহামারির মোকাবিলা করা যায় সে ব্যাপারে নজর দেওয়ার সময়। কিন্তু সরকার যেমন দায়িত্ব নিয়ে মানুষকে ঘরবন্দি করার চেষ্টা করছে, ঠিক সেভাবে গরিব, নিম্নবিত্ত, অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত মানুষের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা সরকারের নেওয়া উচিত। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা ভেবে অবিলম্বে একটি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করাও কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত। যাঁরা আতঙ্কিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র কিনে নিচ্ছেন তাঁদের জন্য সমাজের বিশাল অংশের মানুষ ওই জিনিসগুলি থেকে হয় বঞ্চিত হচ্ছেন, নয়তো সেসবের দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটি তহবিল গঠন করেছে বটে। কিন্তু সেটি মূলত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। করোনার জেরে টালমাটাল অর্থনীতির হাল ধরার জন্য বলিষ্ঠ ও বাস্তবোচিত পদক্ষেপ করা যে সরকারেরই দায়িত্ব সেটাও মাথায় রাখা দরকার। যাঁরা কাজ হারাচ্ছেন তাঁদের আর্থিক স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে। আশা করা যায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি সে ব্যাপারে একশোভাগ সফল হবে। করোনার জেরে কালোবাজারিরা যাতে সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারেও কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে সরকারকে। পাশাপাশি দোকান, বাজারে যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে পুলিশ ও প্রশাসনকে। চিন যখন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হল তখন থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল সরকারের। করোনা যখন ধীরে ধীরে মহামারির আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল তখন কেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি হাত গুটিয়ে বসেছিল সেটা এখনও ধন্দ। এখন তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সবাই মিলে করোনাকে যেমন জব্দ করতে হবে তেমনই মানুষকে ভালোভাবে রাখাটাও সরকারের কর্তব্য।

অমৃতধারা

কোনও ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে মন্দ হতে পারে না এবং সকলের কাছেই সে খারাপ হতে পারে না। মানুষ সম্পূর্ণ ভালো হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ খারাপ কখনও হয় না। কেননা খারাপ ব্যাপার হল কৃত্রিম, আগন্তুক ও অস্বাভাবিক। খারাপের পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই। সেজন্য খারাপের পুনরাবৃত্তি না হলে তা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যায়। সাধকের প্রধান কাজ হল মন্দ ব্যাপার পুনরায় না করা। মানুষ যদি মন্দ কাজ দ্বিতীয়বার না করে তাহলে সে ভালো হয়ে যায়। কাউকে খারাপ ভাবার কোনও অধিকার মানুষের নেই। অপরের খারাপ ব্যবহার যা দেখা যায়, সেগুলি স্বরূপত তার নয়, সেগুলি আগন্তুক। মানুষের স্বভাব হল সে নিজের দোষ ক্ষমা করে, কিন্তু অন্যের দোষ দেখলে তার ন্যায়-অন্যায় বোধ জেগে ওঠে। সাধকের কর্তব্য হল তিনি যেন নিজের ব্যাপারে ন্যায়নীতি মেনে চলেন আর অন্যকে ক্ষমা করে দেন। ভগবানের অংশ হওয়ায় মানুষ মাত্রেই স্বরূপত নির্দোষ।

তাই কোনও ব্যক্তির ওপরই মন্দভাব পোষণ করা উচিত নয়। আগত মন্দের জন্য কাউকে মন্দ মনে করা অনুচিত কাজ। অপর ব্যক্তি খারাপ হোক বা না হোক তাকে খারাপ ভাবলে নিজের মধ্যেই খারাপভাব এসে পড়ে। অপরকে খারাপ বলে মনে হলে নিজের মধ্যেও খারাপ ভাবের উদয় হয়, ক্রোধের উদয় হয়, শত্রুতার উন্মেষ ঘটে, বৈষম্য জন্মায়, পক্ষপাত দেখা দেয়। এগুলির উদয় হলে কর্ম অশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই মন্দের স্থাপনা নিজের মধ্যেও করতে নেই এবং অন্যের ওপরও করতে নেই। এতে নিজেরও হিত হয় না, অপরেরও হয় না। কাউকে মন্দ বলে মনে করা অথবা কারও ক্ষতি করতে চাওয়া, ক্ষতি করার থেকেও দূষণীয়। মানুষ কারও ক্ষতি করতে চাইলে তার ক্ষতি হয় না, কিন্তু যে ক্ষতি করে তার অবশ্যই ক্ষতি হয়।

-স্বামী রামসুখদাস

শব্দরঙ্গ ■ ২৫৬৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। ছোট বাগান বা উপবন ৩। মালকোঁচা, আস্ফালন ৪। গৃহ, বাসভবনের অংশ, ভূসম্পত্তির অংশ ৫। বংশ, বংশ কৌলান্য, উচ্চ বংশে জন্মের গৌরব ৭। নিষ্পত্তি, মিটমাট, আপস, বিনাশ বা শেষ ১০। বিরামচিহ্নবিশেষ ১২। ক্ষীণতা ও দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশক ১৪। অঙ্গীকার, শর্ত, পিঙ্গল বা কপিশ, পিঙ্গল বর্ণের ১৫। অন্তরঙ্গতা, অতিরিক্ত মাখামাখি, কেলেঙ্কারি ১৬। দামি, নারীশ্রমিক।

উপর-নীচ : ১। বাণাসুরের ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব শিব ২। তোষামুদে, তল্পিবাহক ৩। বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখার ঘর, খাজনাখানা ৬। পুত্র, বালক ৮। বাংলা বছরের একটি মাস ৯। স্ত্রী-পুরুষের অভিমানজনিত কলহ ১১। সীমা বা পরিমিতি সম্বন্ধে জ্ঞান ১৩। বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা।

সমাধান ■ ২৫৬৬

পাশাপাশি : ২। গুজগুজ ৫। মহল ৬। নববিধান ৮। পয়া ৯। শনি ১১। মহাকরণ ১৩। বাচিক ১৪। মনপ্রাণ।

উপর-নীচ : ১। গুমখুন ২। গুল ৩। গুজব ৪। পবন ৬। নয়া ৭। বিজনি ৮। পদক ৯। শণ ১০। শশিকলা ১১। মর্কট ১২। রসুন ১৩। বাণ।

গণ উদ্যোগে চিনের অভিজ্ঞতা করোনা মোকাবিলার দিশারি

এই ধরনের সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হলে, মৃত্যু হলে একে দেখতে হবে বিপর্যয় হিসেবে। এরজন্য দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক- মানুষের মধ্যে ভয়, ভীতি, আতঙ্ক দূর করা, তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস দেওয়া। দুই- ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করা। লিখেছেন অশোক ভট্টাচার্য।

করোনায় কম-বেশি আক্রান্ত উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বহু মানুষ। মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক। এতদিন দেখেছি, যে কোনও সংক্রামক রোগে সবথেকে বেশি মানুষ অসুস্থ হয় গরিব দেশে, বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকায়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুওর ইকনমিক্স' বইটির প্রথম নিবন্ধটিতে উল্লেখ করেছিলেন এই সংক্রান্ত কিছু তথ্য। 'থিংক এগেইন অ্যান্ড এগেইন' নিবন্ধটির প্রথম লাইনেই তিনি লিখেছেন, প্রত্যেক বছর সারা বিশ্বে ৫ বছর পূর্তির আগে ৯০ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়। সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রতি ৩০ জন মায়ের ১ জনের মৃত্যু হয় সন্তান জন্মের সময়। অথচ উন্নত দেশে এই হার প্রতি ৫৬০০ জনের মধ্যে ১ জন। সাব-সাহারান আফ্রিকার ২৫টি দেশের মানুষের গড় আয়ু ৫৫ বছর। এই তথ্য থেকেই বুঝতে পারা যায়, উন্নত ও গরিব দেশগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বৈষম্যের করুণ চিত্র। একথা ঠিক, টিকাকরণে ভারত সহ বহু দেশ ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছে। বহু দেশে পুরুষ-মহিলা-উভয়ের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস পেয়েছে ৫ বছরের নীচে শিশুমৃত্যুর হার ও প্রসবকালে মায়েদের মৃত্যুর হারও। ভারতে এইসব ক্ষেত্রে কোনও অগ্রগতি হয়নি, বলা যাবে না।

করোনা সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখকের মনে পড়ছে, আজ থেকে প্রায় দু-দশক আগে শিলিগুড়িতে এমনই একটি রোগের কথা। ২০০১ সালে জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩ সপ্তাহের মধ্যে শিলিগুড়ির প্রায় ৭০ জন মানুষ অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই জ্বরে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর হারের দিক থেকে তা ছিল অভূতপূর্ব। যদিও মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে রোগটি থেকে শহরকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। সবার মুখে এখনকার মতো থাকত মাস্ক, সন্ধের আগে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত, স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল, কোনও বেসরকারি হাসপাতাল কোনও সন্দেহভাজন রোগীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি পর্যন্ত নিতে চাইত না। পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছিল দুজন চিকিৎসক সহ বেশ কয়েকজন নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হওয়ায়। শহর থেকে এক-এক করে বহু চিকিৎসক পালিয়ে যাওয়া শুরু করেছিলেন। বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল বহু ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আমরা জনপ্রতিনিধিরা পুরকর্মী, বেসরকারি সংস্থা, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সংগঠনের কর্মীরা সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এই রোগের সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও ভয়মুক্ত করতে। অনেক চিকিৎসক আবার সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা জীবন বিপন্ন করে চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা থেকে ২৪ জন চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী পাঠিয়েছিল তদানীন্তন রাজ্য সরকার। তারাও এক মাস থেকে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। ২৫ জন রোগীকে সুস্থ করে তাঁরা কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। আমরা যাঁরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম এই কাজের সঙ্গে, তাঁদের একজনও অসুস্থ হইনি। প্রায় ৫/৬ বছর গবেষণার পর জানা গেল রোগটি নিপা-ভাইরাস। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই লেখকের মনে হয়েছিল, এই ধরনের সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হলে, মৃত্যু হলে একে দেখতে হবে বিপর্যয় হিসেবে। এরজন্য দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক, মানুষের মধ্যে ভয়, ভীতি, আতঙ্ক দূর করা, তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস দেওয়া। দুই, ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করা।

এবার আসা যাক করোনা ভাইরাস সম্পর্কে। এই ভাইরাস অবশ্যই নতুন। এখনও এর সম্পর্কে বিশদ জানা যায়নি। প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা। চিনে যে কারণে এই রোগটি দ্রুত ছড়িয়েছে, ভারতেও একই কারণে তা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এর মূল কারণ, চিন ও ভারত দুটি দেশই অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত। দুটি দেশেই দ্রুত নগরায়ণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুটি দেশেই বসবাসের ঘনত্ব বেশি। কেন নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে উন্নত-অনুন্নত সব দেশের মানুষ, চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন? অনেক বিশেষজ্ঞ ৪টি কারণের কথা বলে থাকেন। এক, এর দ্রুত ছড়িয়ে পড়া (Rapid spread)। দুই, মৃত্যুর হার অনেক বেশি। তিন, এর কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই এবং চার, এর সংক্রামিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে অনেক কিছুই এখনও অজানা। ভারতে যদি ১ শতাংশ এই রোগে আক্রান্ত হয়, তবে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে। যদি ২ শতাংশ আক্রান্ত হয়, তবে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হতে পারে ১.৬০ লক্ষ।

ভারতের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি উদ্বেগের কারণ এদেশের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ব্যবস্থার দুর্বলতা। যথেষ্ট অভাব উন্নতমানের ল্যাবরেটরির, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের। অভাব রয়েছে ডেডিকেশনের বা আত্মত্যাগের মনোভাবের। ভারতের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতার দিকগুলি এক-একটি বিপর্যয়ের সময়ে ক্রমেই সামনে এসে পড়ে। ২০১৭-২০১৮ সালের ভারতের আর্থিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এদেশের জিডিপির মাত্র ১.৫ শতাংশ অর্থ স্বাস্থ্য খাতে খরচ করা হয়। যা বহু উন্নয়নশীল দেশ থেকে অনেক কম। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, মালদ্বীপ, নেপাল, আফগানিস্তানের থেকেও কম। আছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি। তৈরি হচ্ছে বহু ওষুধ, স্বাস্থ্য প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে। অথচ দেশের বেশিরভাগ মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। যত দিন যাচ্ছে ততই স্বাস্থ্য পরিষেবা বা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব হ্রাস করছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিগত খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রের খরচ কমছে।

ভারতেও তাই বড় বা মাঝারি শহরগুলিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। ২০১৩ সালের জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন অনুসারে দেশের বড় বা মাঝারি প্রতিটি শহরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকার কথা। থাকার কথা যথেষ্ট সংখ্যক উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। থাকার কথা স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীদের। এই প্রকল্প চালু হলেও দেশের অধিকাংশ শহরে এখনও উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নেই স্থায়ী চিকিৎসক। অধিকাংশ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে একজনও চিকিৎসক নেই। আংশিক সময়ের চিকিৎসক নিযুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার সাম্মানিক দেয় মাত্র ৪০০০ টাকা। শিলিগুড়ির মতো শহরে কোনও স্থায়ী স্বাস্থ্য আধিকারিক নেই। নেই কোনও এন্ডোমলজিস্ট। এরকম একটি দুর্বল জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে কোভিড-১৯ বা নিপা ভাইরাসের মতো সংক্রমণের মোকাবিলা করা কঠিন। এই কারণে করোনা ভাইরাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতে মানুষের উদ্বেগ থেকে যাচ্ছে। ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগতভাবে কতটা প্রস্তুত এই সংক্রমণের মোকাবিলায়? চিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। গত ৭০ বছরের মধ্যে করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতির মতো কখনও এরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চিনকে পড়তে হয়নি। এইরকম পরিস্থিতিকে চিন মোকাবিলা করেছে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের মতো লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে। এরজন্য তাদের প্রতিনিয়ত সমন্বয় রক্ষা করে চলতে হয়েছিল দেশের মধ্যে ও বাইরের দেশের সঙ্গে। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদান ব্যতীত তা কখনও সম্ভব হত না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখ্য অধিকর্তা টেড্রাস বলেছেন, চিনের মতো প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা দায়বদ্ধতা। প্রত্যেক দেশের উচিত, এই প্রশ্নে চিন থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া। এই ভাইরাসে আক্রান্ত ও অসুস্থদের প্রতি চিনের সামগ্রিক জনগণের ভ্রাতৃত্ব বোধ ও সহমর্মিতা প্রদর্শন অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লক্ষ্যমাত্রা হল, এই ভাইরাস থেকে বেশি বেশি মানুষকে মুক্ত রাখা। বেশি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করা। তাদের দ্রুত চিকিৎসা করা। উহান শহরে শি জিনপিং এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃতিত্ব দিয়েছেন উহান তথা চিনের জনগণকে। উহান শহরের মানুষ দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে বের হয়নি, সমস্ত ধরনের জনজমায়েত স্থগিত রেখেছিল। সমস্তরকম যাতায়াত যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে বেসরকারি ব্যবসায়ীরা বিনা পয়সায় কফি পরিবেশন করেছেন শহরের মানুষকে। টলিম্যানরা দৈনিক হাসপাতাল কর্মীদের কাছে খাদ্য ও ওষুধ পৌঁছে দিয়েছেন, প্রতিটি বাড়ির টেবিলে এই দিনগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দিয়েছেন খাবার। মনে রাখতে হবে এই শহরের জনসংখ্যা ১ কোটি। এজন্য নিযুক্ত ছিলেন ২০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক, যাঁরা সেবা প্রদান করেছেন ডেলিভারি ম্যান, ড্রাইভার, কোঅর্ডিনেটর ও কমিউনিটি ওয়ার্কার্স হিসেবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল আরও ২৪ হাজার স্বেচ্ছাসেবক। এর সঙ্গে চিনে রয়েছে একটি স্বাভাবিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

চিন জানিয়েছে, কোভিড-১৯-এ ৯২.৫ শতাংশ আক্রান্তের চিকিৎসা করা হয়েছে ট্র্যাডিশনাল চিনা ওষুধে। সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের ওষুধও। সমস্ত পরিস্থিতিকে তারা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করেছেন উন্নত টেলিব্যবস্থার মাধ্যমে। এমনকি চিকিৎসা পর্যন্ত, এর মাধ্যমেই তারা পৌঁছে দিয়েছে ওষুধ। ৫জি ব্যবস্থায় আক্রান্তের কাছে রোবট পাঠিয়ে তাঁর শরীরের তাপমাত্রা পর্যন্ত মাপা হয়েছে, এমনকি কোনও আক্রান্ত বা সন্দেহজনক অসুস্থের বাড়িকে সংক্রমণ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। কোনও কোনও এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে রোবটের।

করোনা ভাইরাস নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে লড়াই কেবলমাত্র কিছু চিকিৎসকের নয়, এই লড়াই একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ। এই জনযুদ্ধে জয়ের গ্যারান্টি হল ব্যাপকতম জনগণকে যুক্ত করা। এর জন্য চাই গণ উদ্যোগ। দেশপ্রেম, দায়বদ্ধতা, দায়িত্বশীলতা, অংশগ্রহণ, ত্যাগ, সাহস, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা ইত্যাদি এর বড় হাতিয়ার। চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছাও। চাই দেশের মধ্যে ও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমন্বয় ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র শীর্ষ অধিকর্তার পরামর্শ এরকমই।

লেখক শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র

> **শিলিগুড়ির মতো শহরে কোনও স্থায়ী স্বাস্থ্য আধিকারিক নেই। নেই কোনও এন্ডোমলজিস্ট। এরকম একটি দুর্বল জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে কোভিড-১৯ বা নিপা ভাইরাসের মতো সংক্রমণের মোকাবিলা করা কঠিন। এই কারণে করোনা ভাইরাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতে মানুষের উদ্বেগ থেকে যাচ্ছে। ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগতভাবে কতটা প্রস্তুত এই সংক্রমণের মোকাবিলায়?**

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

করোনায় ম্লান বসন্ত নবরাত্রি

করোনা আতঙ্কের মধ্যেই শুরু হয়েছে বসন্ত নবরাত্রি তথা বাসন্তীপুজো। শারদীয় দুর্গাপুজো বা শারদীয় নবরাত্রির মতোই এখানেও দেবী আদিশক্তির মূল নয়টি রূপের পুজো করা হয়। নয় দিনব্যাপী দেবী শৈলপুত্রী, মা ব্রহ্মচারিণী, মা চন্দ্রঘণ্টা, মা কুষ্মান্ডা, মা স্কন্দমাতা, মা কাত্যায়নী, মা কালরাত্রি, মা মহাগৌরী, মা সিদ্ধিদাত্রীর পুজো হয়। মা দুর্গার মূল এই নয়টি রূপের সাধনা একাধারে আধ্যাত্মিক ও অপরদিকে অশুভের ওপর শুভর বিজয়গাঁথা, মনের পাপবোধ নাশ করে পবিত্রতার পুনঃজাগরণের প্রচেষ্টা।

পুরো দেশ তথা আমাদের বাংলার বিভিন্ন স্থানে মানুষজন এই শক্তির সাধনায় ব্রতী হয়ে ওঠে। কিন্তু এবার করোনা আতঙ্কে সেই আনন্দ উৎসবেও ভাঁটা পড়েছে। বৈষ্ণদেবী থেকে শুরু করে তারাপীঠ দেশের প্রায় সব মন্দির এখন বন্ধ। এর কারণ করোনা সংক্রমণের ভয়। করোনা আটকাতে এখন একমাত্র উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। এরই অঙ্গ হিসেবে দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী, দেশের মানুষকে ঘরে থাকতে অনুরোধ করেছেন। এমতাবস্থায় আমাদের রাজ্যেও এবার সর্বজনীনভাবে বাসন্তীপুজো অনুষ্ঠিত হবে না।

আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে শত কাজের মধ্যে একটু আরাম হল আমাদের উৎসবগুলি। যদিও এই পরিস্থিতিতে উৎসবপ্রিয় বাঙালির মনে বিষাদের ছায়া। তবুও আমাদের এই নিষেধ মানতেই হবে। লকডাউনকে অবহেলা করা যাবে না। কারণ করোনা নামক ভয়াবহ দানবের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার এটাই একমাত্র পথ।

তবুও কিছু মানুষ এখনও সচেতন নন। এই লকডাউনের মধ্যেই তাঁরা অকারণে বাইরে বের হচ্ছেন। জটলা করছেন এবং আড্ডায় মশগুল হচ্ছেন। তাঁরা হয়তো পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না আগামী ২১ দিন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। করোনা সংক্রমণের এই সূত্র বা চেন ভাঙা একান্তই দরকার। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইতালি ও স্পেনে করোনা আক্রমণের ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমরা প্রতিনিয়ত ওয়াকিবহাল হচ্ছি। ভারতের যা জনসংখ্যা এবং জনঘনত্ব সেখানে একটুখানি অসাবধানতা পুরো ভারতবর্ষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।

তাই এখন আমাদের উচিত ঘরে থাকা এবং যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা। যদি দেশ ও জাতি রক্ষা পায় তবে আমরা আবার আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে পারব। সবাইকে অনুরোধ, এই কঠিন পরিস্থিতিতে সবাই নিজের স